স্বজ্ঞা: সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে

দীপেন ভট্টাচার্য

১. আত্মহত্যার সমস্যা

খ্যাতনামা ফরাসি লেখক ও দার্শনিক অ্যালবার কাম্যু তাঁর "সিসিফাসের কিংবদন্তি" (The Myth of Sisyphus) বইতে লিখেছেন মানুষের সবচেয়ে বড় দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে আত্মহত্যা। কাম্যু লিখেছেন, মানুষ সব সময় তার জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সন্ধান করে, কিন্তু অচেতন পৃথিবী ও মহাবিশ্ব মানুষকে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে দেয় না, জীবনের অভিযানের অন্তর্নিহিত কোন স্বচ্ছতা ধরতে দেয় না। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরণের অর্থহীনতা, কাম্যু যাকে বলেছেন absurd ।

চিত্র ১: সিসিফাসের চিরায়ত ও অর্থহীন শ্রম

মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে গ্রীসের দেবতারা সিসিফাসকে পাহাড়ের ওপর একটা বিশাল পাথর উত্তোলন করার আদেশ দেয়, কিন্তু পাহাড়ের চুড়ায় পাথরটি ওঠানো মাত্র সেটি গড়িয়ে নিচে নেমে যায়। সিসিফাসকে নিচে নেমে আসতে হয়, পাথরকে আবার পাহাড়ের ওপর ওঠাতে হয়, পাথর আবার নিচে নেমে আসে। এই ভাবে চলে অসীম সময় পর্যন্ত, এই হল সিসিফাসের ওপর দেবতার অভিশাপ। মানব জীবনকে সিসিফাসের absurd কাজের সাথে তুলনা করা চলে, ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে জীবনের আপাতঃ অর্থহীনতা সম্বন্ধে যারা চিন্তা করে তাদেরকে এই absurd আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। মৃত্যু দিয়ে যদি জীবনের সীমানা নির্ধারিত হয়, তবে চিন্তা, চেতনা ও যুক্তির সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য, সেই ক্ষেত্রে নিজের জীবনের অবসান পৃথিবীর দৈন্যতা থেকে মুক্তির পথ বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু কাম্যু বলছেন মানুষকে এই দ্বন্দ্বকে মেনে নিতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অর্থহীনতা। ত্যাগ করতে হবে সমস্ত আশা। আশা-আকাঙ্ক্ষার বোঝা যখন মানুষ ঘাড় থেকে নামাতে পারবে, তখনি নিজেকে সে স্বাধীন বা মুক্ত বলে ভাবতে পারবে। কাম্যুর জগতে এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে "বিদ্রোহ"– জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

অনেকে বলতে পারেন আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কাম্যুর বিদ্রোহ এক ধরণের রোমান্টিক ভাবনা। যে মহাবিশ্ব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধার ধারে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কি লাভ?

মানব জাতি এই সমস্যার সমাধান হয়তো করতে পারেনি, কিন্তু আমরা জানি সাধারণতঃ মানুষ আত্মহত্যা করে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য[১] অনুযায়ী আত্মহত্যার সংখ্যা বছরে এক হাজার থেকে দশ হাজার জনে এক জন বা তারও কম। দেশ অনুযায়ী এই সংখ্যার তারতম্য আছে, পুরুষরা মহিলাদের থেকে বেশি আত্মহত্যা করে থাকে এবং বয়সের সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে । বেশির ভাগ মানুষই অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়, তারা নিজের জীবনের সব সম্পর্ক (পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতি) নিয়ে এক ধরনের অর্থ গড়ে তোলে, আর সেই "নিজেকে বিশ্বাস করানো" অর্থের মাঝে তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিমজ্জিত করে সুখের সন্ধান করে।

কয়েকশো কোটি বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তন আজকের এই ভারসাম্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যা আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ যোগাচ্ছে ও পৃথিবীতে মানব প্রজাতির নিরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে নিশ্চিত করছে। প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় সমাজের মধ্যে আমরা যে ন্যায়-নীতির বিচার প্রতিষ্ঠা করি, আর মানুষের প্রকৃতি ক্রমাগত সেই ন্যায়-নীতিকে বির্বতন করছে । পৃথিবীর বুকে মানুষ প্রজাতি এক লক্ষ বছরের ওপর বাস করছে, এক ধরনের মজ্জাগত সহযোগিতা বোধ না থাকলে মানুষ এতো দিন পৃথিবীর বুকে থাকতো না ।

আমার মনে হয় এমন কি যে সব মানুষ যারা মনে করে ন্যায়-নীতি ঈশ্বর প্রদত্ত লিপির মধ্যে লুকানো, তারা নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতি অনুযায়ী এক ধরনের অস্থায়ী "কাজ চলে যায়" গোছের বিচার বোধ সৃষ্টি করে। খুব হালকা ভাবে দেখলে - আমরা সাধারণতঃ মিথ্যে কথা বলি না কারণ আমরা জানি যদি সবাই মিথ্যে বলে তার পরিণাম কি হতে পারে, আমরা সাধারণতঃ অন্য একটি মানুষকে হত্যা করি না কারণ আমরা জানি সবাই হত্যাকারী হলে সমাজ অস্থিত হয়ে পড়বে, তাতে একক হত্যাকারীরও বাঁচার সম্ভবনা থাকবে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আনুমানিক ১৮৫০ সাল নাগাদ অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়, "আমারদিগের ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ না হইলে প্রতারণা ও মনুষ্য-বধে অর্ন্তকরণ প্রফুল্ল হয় না"[২]। তাই সমস্ত সমাজতত্ত্বের শুরু জীববিদ্যায়।

২. জীববিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কের গঠন নির্ধারণ করে দেয় । এটা মনে করা একেবারে অযৌক্তিক হবে না যে অলৌকিক চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছে আমাদের বিবর্তিত মস্তিষ্কের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে। নৃতত্ত্ববিদ বারবারা কিং এর মনে করেন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ভব হয়েছে মানুষ আবির্ভাবের সঙ্গে - কয়েক লক্ষ বছর আগে[৩]। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী ভিলানোর রামাচান্দ্রান Phantoms in the Brain বইতে[৪] এই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণার উল্লেখ করেছেন। রামাচন্দ্রানের মতে ঈশ্বর সংক্রান্ত যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বস্তু জগতকে অতিপ্রাকৃত অর্থ আরোপ করা, বা যে কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা তা সবই আসছে মস্তিষ্কের টেমপোরাল লোব (temporal lobe) - মস্তিষ্কের ডান ও বাঁ দিক - থেকে । তিনি আরও লিখেছেন, "এমনটা কি হতে পারে যে বিবর্তনের ফলে মানব প্রজাতি তাঁর মস্তিষ্কে এক বিশেষ ধরনের নিউরাল সার্কিট সৃষ্টি করেছে যা কিনা ধর্মীয় অনুভূতির উদ্ভব করে? অতি-প্রাকৃতের ওপর মানুষের বিশ্বাস সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে এমনভাবেই প্রোথিত যে মনে হতে পারে সাধারণ জীববিদ্যাই হচ্ছে এই ধরনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি।"

মানুষ তাঁর জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে হয়তো নিজের মাথায় সৃষ্টি করেছে এমন একটা বলয় যা কিনা তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করেছে, ডারউইনীয় অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের আলোকে বলা যায় এই বলয় বা নিউরাল

সার্কিট মানুষকে প্রাকৃতিক ও মানসিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বাঁচতে সাহায্য করেছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু মতান্তর থাকলেও এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে টেমপোরাল লোবের ক্ষত থেকে যে এপিলেপসি বা মৃগী রোগ হয় তা রোগীদের মহাবিশ্বকে ভিন্ন রূপে দেখায়। কানাডীয় মনস্তত্বঃবিদ মাইকেল পারসিংগার[৫] যে গবেষণা করেছেন তা প্রমাণ করেছে যে এই ধরনের রোগীরা তাদের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে, তাদের কাছে এই উপস্থিতি একেবারে বাস্তব, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয় । যেহেতু তারা এই আবির্ভাবের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত সেহেতু তাদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে । অনেকে মনে করে তাদের জীবনের দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা। পারসিংগারের গবেষণা আরো দেখায় যে মৃগী রোগী নয় এমন লোকেরও টেমপোরাল লোবে জোরাল তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিকিরিত করে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অসীমতার ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব[৬] ।

অসীমতার বোধকে আমাদের স্বত্তাই সৃষ্টি করে, আবার সেই বোধকে আমাদের স্বত্তাই অনুধাবন করে। কিন্তু আমাদের স্বত্তা সৃষ্টি হয় কি ভাবে? কি ধরনের নিউরনের সংকেত আমাদের আমিত্ত্ব, অহম বা "আত্মা" সৃষ্টি করে? যেই ইলেকট্রন স্রোত ধারা চেতনার সৃষ্টি করে, সেই চেতনা কি তার উৎস ধারাকে চিহ্নিত করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা খুঁজছে।

৩. বাস্তবতা

মস্তিষ্কের এক অংশে (বা বিভিন্ন অংশে) সৃষ্ট চেতনা মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাহায্যে মহাবিশ্বের বাস্তবতা খুঁজতে চায়? এখানে আমাদের পরিবেশকে জানবার জন্যে গাঢ় দাগের কিছু প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করি। প্রথমে বলি শব্দের কথা। বাইরের থেকে আগত শব্দ তরঙ্গকে আমরা মস্তিষ্কের মাঝে শব্দ নামে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করি (নৈর্ব্যক্তিক ভাব দেখলে "শব্দ" বলে কিছু নেই, এই প্রসঙ্গে পরে আসছি) , শুধু তাই নয় সেই শব্দ-অনুভূতিকে আমরা আবার বাইরের উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। যদি শেষোক্ত ক্রিয়াটি না ঘটতো তবে সমস্ত শব্দ ধ্বনি আমাদের মাথার মধ্যে থেকে যেতো, তাতে কোনো লাভ হতো না... আমাদের মস্তিষ্ক এক অর্থহীন শব্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে থাকত। এবার ধরা যাক আলোর কথা। বাইরের তথ্য বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন মাধ্যমে আপতিত হয় আমাদের চোখের রেটিনার ওপর। দৃশ্য সৃষ্টির স্নায়ুতন্ত্র ফোটনের সংকেত সঞ্চার করে মস্তিষ্কে, সেখানে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে দেয়া হয় বিভিন্ন রঙ – লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি। প্রকৃতিতে কি এই রঙগুলো আছে ? নেই। বস্তুসমূহকে রঙ্গিন করে চিত্রিত করলে তাকে সহজে চিহ্নিত করা যায়, প্রকৃতির প্রতিযোগিতায় এই বৈশিষ্ট্যটির আবির্ভাব মানব প্রজাতির ক্রমান্বয়তা নিশ্চিত করেছে । কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক শুধুমাত্র বাইরের রঙ্গিন দৃশ্য-ই নির্মাণ করে না, সে দৃশ্যকে বহুমাত্রিক জ্যামিতিতে আরোপ করে এক আপাতঃদৃষ্টিতে ত্রিমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করে। তাই এক অন্ধ ও অন্ধকার মহাবিশ্বের বাস্তবতা নির্ধারণে মস্তিষ্কের "অনুবাদক" ভূমিকা অপরিহার্য। (অন্ধকার মানে কালো নয়, শুধুমাত্রা নিউরনের আচরণ দিয়ে রঙের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাবে না, রঙের অনুভূতির প্রসঙ্গে পরে আসছি ।)

তবুও যে কোনো বস্তুর গঠন আমাদের দৃষ্টিতে তার সঠিক রূপে ধরা পড়ে না। আমাদের শরীর বা যে কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত গঠন মূলত ফাঁকা জায়গা। যে পরমাণু দিয়ে বস্তু সৃষ্টি সেই পরমাণুর অভ্যন্তর বা গঠন বলতে গেলে শূন্যস্থান দিয়েই পূর্ণ। আমরা যদি একটা পরমাণুর মডেল গড়তে চাই তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস হিসেবে একটা চা-এর কাপ ভাবা যেতে পারে, চায়ের কাপটা একটা বড় ফুটবল

স্টেডিয়াম-এর মাঝে রেখে দিলে স্টেডিয়ামের পরিধিটা হবে পরমাণুর পরিধি। এখন স্টেডিয়ামের মধ্যে কিছু মাছি ছেড়ে দিলে সেগুলোকে আমরা বলবো ইলেকট্রন। দেখা যাচ্ছে স্টেডিয়ামটা মূলতঃ শূন্যস্থান দিয়েই ভর্তি! আমাদের শরীর এই রকম ফাঁকা পরমাণু দিয়ে গঠিত। ফাঁকা পরমাণু দিয়ে গঠিত মানব দেহ, পিরামিড, তাজমহল, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্ররা।

এই সমস্ত বস্তু যদি ফাঁকা জায়গা দিয়েই গঠিত হয়, তবে তাদেরকে কেন আমরা কঠিন ও অস্বচ্ছ হিসেবে দেখি? সূর্যের দৃশ্যমান আলো যখন আমাদের শরীরের ওপর পড়ে, তখন তা ত্বকের ওপরের পরমাণু (বা অণু) দ্বারা শোষিত হয়। এর কিছুক্ষণ পরে সেই শোষিত শক্তির কিছু অংশ ত্বক বিকিরণ করে। এই বিকিরণ চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্ক অনুধাবন করে, আর বাকি শোষিত শক্তিটুকু ত্বকের মাঝে তাপ সৃষ্টি করে। যেহেতু দৃশ্যমান আলো ত্বকের প্রথম স্তরেই শোষিত হয়ে যায় সেহেতু আমাদের দেহের একটা অস্বচ্ছ রূপ আমরা দেখি।

আলো তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে ছোট জিনিসকে চিত্রায়িত করতে পারে না। যেহেতু অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকের থেকে কম তাই আমরা যদি অতিবেগুনী রশ্মিতে দেখতে পারতাম তাহলে আমাদের শরীরের অনেক সূক্ষ্ম গঠন প্রতিভাত হত। যদি আমরা এক্স-রেতে দেখতে পারতাম তাহলে আমাদের ত্বক বা মাংস অদৃশ্য হতো, হাড় বাদে আমাদের শরীর কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যেতো। তখন তাই হতো বাস্তবতা।

সূর্যের বিকিরণ দৃশ্যমান আলোয় হয় সবচেয়ে বেশি যদিও সূর্য অতিবেগুনি ও অবলোহিত তরঙ্গেও বেশ পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। স্তন্যপায়ী জন্তুরা কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যের বিকিরণ অনুযায়ী বির্বতিত হয়েছে, তাদের চোখের স্নায়ুতন্ত্রী সূর্য থেকে আগত ফোটন সংখ্যা অনুযায়ী তার সংগ্রহ ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে। এই কারণে আজ আমরা শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে মহাবিশ্বকে দেখি, বিশাল বাস্তবতার খুব ছোট একটা অংশকে আমাদের সরাসরি বোধ দিয়ে অনুধাবন করি।

মহাবিশ্বকে সমগ্রভাবে বোঝার জন্য আমরা বিজ্ঞান চর্চা করছি, অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করছি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে পরমাণু ও অণুর গঠন বোঝার চেষ্টা করছি, দূরবীণ দিয়ে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তের গ্যালাক্সি দেখছি, পুরাতন সময়ের ফসিল দিয়ে বিবর্তনের ধারা বোঝার চেষ্টা করছি। এই সবই আমাদের মহাবিশ্ব এবং আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপে ধরার চেষ্টা।

বাস্তবতার আরো রূপ থাকতে পারে। স্ট্রিং বা সুপারগ্র্যাভেটি প্রকল্প আমাদের বলছে যে আমাদের মহাবিশ্বের দশটা বা এগারটা মাত্রা থাকতে পারে। আমরা এর মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি মাত্রা বুঝতে পারি, বাকি মাত্রাগুলো নাকি খুবই ছোট ও গোলাকৃতি হয়ে স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই ছোট মাত্রাগুলো বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের প্রকৌশল দিয়ে উন্মোচিত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব মাত্রাসমূহের অস্তিত্ব কী আসলেই আছে? এর উত্তর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান দিতে পারবে, তবে যেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে ("অস্তিত্বহীনতার" বদলে) এবং বাস্তবতাকে আমরা sample করি আমাদের স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতায়, এটা মনে করা অসংগত হবে না যে স্থান ও কাল হয়তো বৃহৎ কোনো বাস্তবতার অংশ – সেই বৃহৎ মহামহাবিশ্বের রূপরেখায় স্থান ও কাল অসংখ্য সম্ভাবনার একটা বাস্তবায়ন মাত্র।

৪. উদ্দেশ্যহীনতা

কিন্তু বাস্তবতার গঠন ও প্রকার নিয়ে আমরা যত ভেবেছি ততই এর আপাতঃ উদ্দেশ্যহীনতা আমাদের বিষাদগ্রস্ত করেছে। স্টিভেন ভাইনভার্গ তার প্রথম তিন মিনিট বইতে লিখেছেন, “The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless.” বক্তব্যটা ইংরেজীতেই রাখলাম মূলতঃ pointless কথাটার জন্যে। (এই উক্তির জন্যে ভাইনভার্গকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছে।) আমাদের মানসিক ক্যাটাগরির বাইরে মহাজগৎ এক “অন্ধকার” রাজত্বে বাস করে, অতি উজ্জ্বল তারাদের আলোর বর্ণালী কোনো মানসিক অনুবাদ ছাড়া অদৃশ্য তরঙ্গই থেকে যায়। কয়েকশো কোটি বছর ধরে যে নক্ষত্ররা জন্মেছে, আলো বিকিরণ করছে, বিস্ফোরিত হয়েছে বা নিষ্ফল মরে গেছে, তার অর্থ কি?

আমাদের দেহ যে সমস্ত জটিল উপাদান দিয়ে তৈরি (অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, লোহা, ইত্যাদি) তারা সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের পূর্ববর্তী নক্ষত্র সমূহের অভ্যন্তরে, সেই সৃষ্ট উপাদান সুপারনোভা বিস্ফোরণ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাশূন্যে, তারপর সৌর-মন্ডল সৃষ্টির সময় সেই উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পৃথিবীর গঠনে, পরবর্তীতে জীব-বিবর্তনের ফসল হিসেবে আজ সেগুলি আমাদের শরীরের অংশ। কাজেই সচেতন মানুষের আবির্ভাবের জন্যে কয়েকশো কোটি বছরের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই মহাবিশ্বের আজকের বয়স চেতনা সৃষ্টির জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই পুরাতন নক্ষত্রদের জীবন যেন নিষ্ফল নয়, এই ধারার চিন্তাধারা এনথ্রোপিক সূত্রের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত (বাংলা ভাষায় অভিজিৎ রায় এই নিয়ে একটা সুন্দর
আলোচনা করেছেন[৭]) ।

এনথ্রোপিক সূত্রের একটা উপপাদ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কোটি কোটি (বা অসীম সংখ্যক) মহাবিশ্ব থাকতে পারে যে মহাবিশ্বগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার মধ্যে কিছু মহাবিশ্বে পদার্থবিজ্ঞানের নীতি ও ধ্রুবকগুলো এমন হতে পারে যা জীবন ও চেতনা বিকাশের জন্যে উপযুক্ত। এটা একটা লটারী খেলা, পাশার গুটির চালে আমাদের মহাবিশ্বের বিজ্ঞানসূত্র জীবন বিকাশে সাহায্য করেছে।এই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধারণাটা মোটামুটি যৌক্তিক, কিন্তু আপাততঃ এটাকে প্রমাণ করার কোন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই, অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের ধারণা এখন কল্পনা-অনুমান (speculation) হিসেবে থাকছে, তাকে hypothesis বলা যাচ্ছে না। অসংখ্য মহাবিশ্বের কোন সম্মিলিত তত্ত্বও আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মন অসংখ্য মহাবিশ্বের ধারণাকে ভেবে নিতে পারে, যদিও আমাদের জীবনে সেই সমস্ত মহাবিশ্বের কোন ভূমিকা নেই। আমাদের জীবনে তাদের অস্তিত্ব pointless!

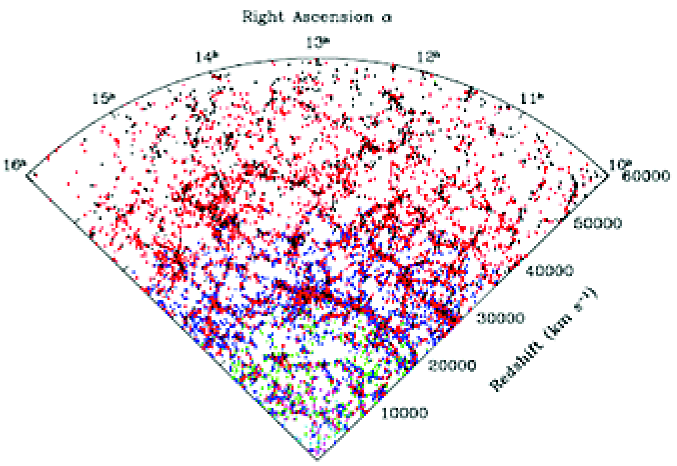

চিত্র ২: SLOAN দূরবীনের ডিজিটাল স্কাই সার্ভে কৃত নিকটবর্তী মহাশূন্যে গ্যালাক্সির মানচিত্র[৮] ।
এখানে প্রতিটি বিন্দু একটি গ্যালাক্সি ।

বর্তমানে SLOAN দূরবীনের ডিজিটাল স্কাই সার্ভে[৮] আমাদের নিকটবর্তী মহাবিশ্বের (কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষের মধ্যে) মানচিত্র তৈরি করছে। দুই নম্বর চিত্র-টিতে SLOAN পর্যবেক্ষিত প্রায় এক লক্ষ গ্যালাক্সির একটা মানচিত্র দেখানো হয়েছে, এটা আকাশের একটা ছোট্ট অংশ মাত্র, এর প্রতিটি বিন্দু একটি গ্যালাক্সি এবং ত্রিমাত্রিক দৃশ্যকে দুটি মাত্রায় দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে আমরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখেছি (সমগ্র মহাবিশ্ব অসীম হতে পারে) ।প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নক্ষত্র থাকতে পারে। কোটি কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে কি প্রাণ থাকতে পারে না, বা সেই প্রাণের মধ্যে আমাদের মত সচেতনতার উদ্ভব হতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু এই গ্যালাক্সিগুলো এত দূরে যে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। অনেক দূর ভবিষ্যতে কোন গ্যালাক্সি থেকে কোন সংকেত হয়ত আমরা পেতে পারি, তার উপর ভিত্তি করে আমরা আর একটা কল্পনার জগত গড়তে পারি, আমাদের দর্শন পালটাতে পারি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জগতে সেই সংকেত কোন ভূমিকা রাখবে না। আবার অন্যভাবে দেখলে যেহেতু দর্শনের সংগে জীবনের যোগসূত্র অচ্ছেদ্য, সুদূর গ্যালাক্সির সামান্য একটি সচেতন সংকেত আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে ! যেটাই হোক না কেন, এই সমস্ত গ্যালাক্সির বাসিন্দাদের সাথে আমাদের হয়তো কোন দিনই দেখা হবে না। এই ভাবে ভাবলে মহাবিশ্বের এই বিশাল গঠনকে pointless বলা অসঙ্গতঃ হবে না।

৫. অনুভূতির অভ্যন্তরেঃ কুয়ালিয়া

বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে বাস্তবতার কোন নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব নেই । মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, স্থানের বহুমাত্রিকতা, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের চেতনার বাইরে নিশ্চয়ই কোন একটা বাস্তবতা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বুঝতে চাই তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই প্রতিনিধিরা আমাদের স্বত্তার কাছে বর্হিবিশ্বকে উদ্ভাসিত করে রঙ, শব্দ, গন্ধ, গঠন, গতি, আনন্দ বা মনোবিকারের মত খুবই ব্যক্তিগত অনুভূতির উৎপত্তি করে যা কিনা দ্বিতীয় কোন স্বত্তা দেখতে বা বুঝতে পারবে না। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে বলছেন quale (কুয়ালি) বা বহুবচনে qualia (কুয়ালিয়া)[৪,৯] । চোখ থেকে এক ধরনের স্নায়ু মাধ্যমে সংকেত মস্তিষ্কতে পৌঁছায়, আমাদের মস্তিষ্ক সেই

সংকেতকে একটা ত্রিমাত্রিক বিশ্বে পরিণত করে। কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিশ্বের তথ্য সৃষ্টি এক জিনিস আর তথ্যকে স্বজ্ঞার মানসপটে প্রক্ষেপণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এর উপমায় বলা যায় ক্যামেরা, সেট, প্রেক্ষাপট, অভিনেতা, পরিচালক, ইত্যাদি দিয়ে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করে ফিল্মে বা ডিস্কে আবদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে প্রজেক্টর মাধ্যমে পর্দায় না ফেললে পুরো ঘটনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে স্বজ্ঞার অনুধাবন প্রক্রিয়ায় প্রজেক্টর মাধ্যমে চিত্রায়িত দৃশ্যটিকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করার কোন সুযোগ নেই।

কিছু নিউরনের সমষ্টি কেমন করে সেই দৃশ্য সৃষ্টি করে, সেই রঙ কোন জায়গা থেকে আসে যা কিনা শুধুমাত্র আমার মনে উদ্ভাসিত হয়? প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা এখনো মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীদের হাতের বাইরে। জড় প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই কুয়ালিয়া বোধের কোনো উদাহরণ বা উপমা আমরা পাব না, কুয়ালিয়া নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ বর্তমান জ্ঞান দিয়ে করা সম্ভব নয়। তবে আমরা জানি যে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে এই কুয়ালিয়া বোধের (উচ্ছাস, বিষন্নতা, গন্ধ) সৃষ্টি করতে পারেন। কুয়ালিয়া সৃষ্টি হয় আমরা জানি, কিন্তু সেই সৃষ্টিকে আমাদের স্বত্তা কি করে অনুধাবন করে তা বোঝা কঠিন।

নিচের ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করুন: লাল, সবুজ, বেগুনী, সাদা ও কালো এই পাঁচটি রঙের আয়তক্ষেত্র দেয়া হয়েছে। এই জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলো থেকে আমাদের চোখের রেটিনায় পড়ছে ৬৫০ (লাল), ৫৫০ (সবুজ) ও ৪৫০ (বেগুনী) ন্যানোমিটারের তরঙ্গ, সাদা আয়তক্ষেত্র থেকে আসছে ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের তরঙ্গসমূহ, আর কালো ক্ষেত্র থেকে কার্যতঃ কোন তরঙ্গই বিকিরিত হচ্ছে না। আমাদের মস্তিষ্ক ওই তরঙ্গগুলোকে অনুবাদ করছে রঙে, সেই রঙ আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে লাল, সবুজ বা বেগুনী কোনো বোধ থাকার কথা নয়, আলোর কোনো রঙ নেই। এই লালের বোধতা হচ্ছে একটা নিজস্ব ব্যক্তি-স্বত্তার অনুভূতি, একে বাইরে থেকে কোনো যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে না। লাল রঙের অনুভূতিকে আমরা নীল করে দিতে পারি না, আবার আপনি যে গাঢ়ত্বের লাল দেখবেন আমি তা নাও দেখতে পারি, কিন্তু সেই পার্থক্যকে ধরার জন্য কোনো পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

সাদা ও কালো রঙের ব্যাপারটা আরো অদ্ভূত । সাদা রঙ সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্রণে এবং কালো রঙ হচ্ছে তরঙ্গের অনুপস্থিতে । আবার কোন কোন সময় খুব উজ্জ্বল উৎসের পাশে অনুজ্জ্বল উৎসকে আমরা কালো হিসেবে দেখি । আলোক ফোটনের অনুপস্থিতি সৃষ্টি করে কালো কুয়ালিয়া । মহাশূন্যকে আমরা বলছি কালো, সে কি আসলেই কালো? শুধুমাত্র স্নায়ুর অনুরণন দিয়ে কুয়ালিয়া ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কুয়ালিয়া-র অস্তিত্ব বা ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে, তবে এটা ontologyর (বস্তু ও জীবনের সম্পর্ক নিয়ে দর্শন) একটা বিরাট গবেষণার বিষয়।

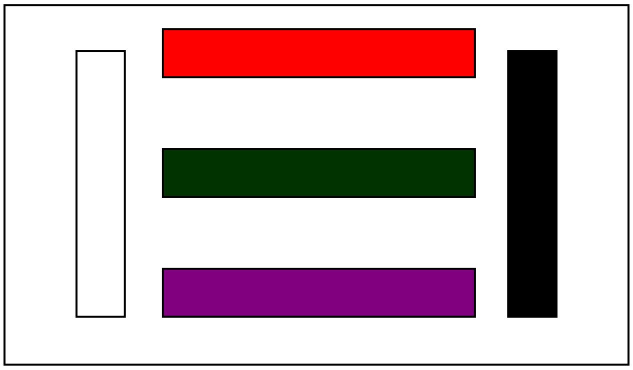

চিত্র ৩: প্রকৃতি-তে লাল, সবুজ বা বেগুনী রঙের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু মস্তিষ্কে নিউরনের কার্যকলাপ আমাদের স্বত্তায় ওই রঙগুলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে।

শুধু আলোক বা শব্দ তরঙ্গই নয়, মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনেক হরমোন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বোধ ও ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে। অক্সিটোসিন আমাদের উদার করে, মস্তিষ্কের সামনের দিকে ফ্রন্টাল লোবে ডোপামিন কমে গেলে তা আমাদের মনোযোগ ও স্মৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেরাটনিনের অভাব আমাদের বিষণ্ন করে। যেহেতু এই ধরনের অনুভূতির ক্যাটাগরি জীব দেহের বাইরে নেই (এবং এই ধরনের ক্যাটাগরি অসংখ্য হতে পারে), তারা সবই কুয়ালিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে।

জীবনানন্দ দাশ তার বোধ কবিতায় লিখেছেন,

আলো অন্ধকারে যাই, মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে !
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালবাসা নয়.
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে.
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পন্ড মনে হয়.
সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।

কবির মস্তিষ্ক অসংখ্য কুয়ালিয়ায় পূর্ণ, তাদের সম্মিলিত ভাবে বোধ বলছেন কবি । বোধ সৃষ্টি করছে স্বত্তা, স্বত্তা সৃষ্টি করছে বোধ ।

৬. মৃত্যুর পরে

চার নম্বর পরিচ্ছেদে (উদ্দেশ্যহীনতা) আমি যখন বলেছি “আমাদের” সঙ্গে অন্য গ্যালাক্সির সভ্যতার দেখা হবে না, আমি “আমার” স্বত্তাকে দূর ভবিষ্যতে বিস্তার করতে চেয়েছি মানব সভ্যতার অংশ হিসেবে। কিন্তু সেই দূর ভবিষ্যতে আমার কোন ধরনের অস্তিত্ব থাকবে না, আমার স্বত্তা বা মন আমার

মস্তিষ্ক-নির্ভর, যে নিউরন সমষ্টি আমার সমস্ত কুয়ালিয়া সৃষ্টি করে, তাদের ধ্বংসের পরে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে ব্যক্তি-স্বজ্ঞারও সমাপ্তি হবে।

মৃত্যুর রূপ কিরকম হতে পারে তা আমরা প্রতিদিন “অনুভব” করি। স্বপ্নবিহীন ঘুম হচ্ছে একধরনের মৃত্যু। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী জেরাল্ড এডেলমান তার Universe of Consciousness, How Matter becomes Imagination বইতে[৯] লিখছেন, “আমরা জানি আমাদের এই দুর্লভ সচেতনতা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সামান্য আঘাত বা মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র রাসায়নিক অসামঞ্জস্যতার জন্যে। ধরতে গেলে আমাদের সচেতন জীবন সবসময়ই ধ্বংস হচ্ছে যখন আমাদের ঘুমে স্বপ্ন থাকে না...”। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা দেখেছেন স্বপ্ন ছাড়া ঘুমের সময় মাথার নিউরনরা একসাথে ছোট কম্পাঙ্কে (১ থেকে ৩ হার্টজ) আচরণ করে, নিউরনের সেই আচরণে চেতনা হারিয়ে যায় (৪ নমবর চিত্র)। তাছাড়া অপেরেশানের সময় অচেতনকারী রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে রোগীর চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়। ঘুম বা ক্লোরোফর্ম দুটোই আমাদের মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়।

নিউরনের তরঙ্গের মত সংকেত প্রদানে চেতনা হারিয়ে যায়, ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তটিকে স্মরণ করতে পারি, মাঝখানে স্বপ্ন না থাকলে সেই অন্তর্বর্তী অংশটিতে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। জন্ম হবার আগে যেমন আমাদের স্বজ্ঞা ও স্বত্তা ছিল না, ঘুমের মধ্যেও তারা না থাকতে পারে। তবে স্বজ্ঞা না থাকার ব্যাপারটা এতই বিমূর্ত ও ব্যক্তিগত যে এর কোন নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

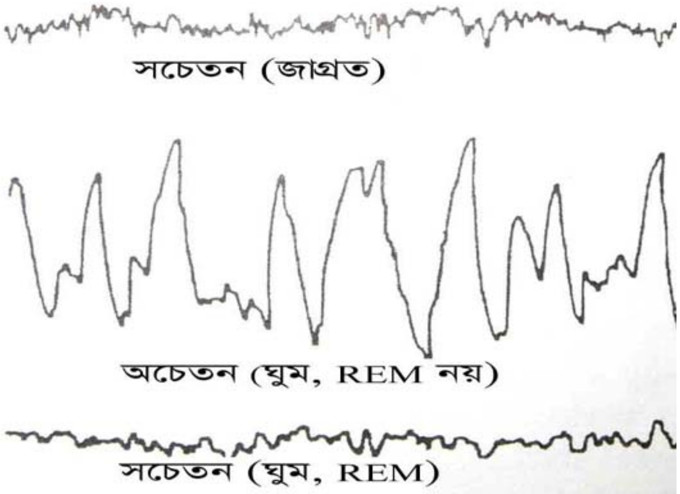

চিত্র ৪: জেগে থাকা অবস্হায় ও REM ঘুমের সময় নিউরনের আচরণ একই রকম। স্বপ্ন-ছাড়া ঘুমের সময় নিউরনের আচরণ ভিন্ন, এই সময় নিউরন সমষ্টি স্বজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে না। G.E. Edelman &G. Tononi (২০০০) থেকে গৃহীত[৯]।

তবুও আমার মন আমার দেহের ধ্বংস কল্পনা করতে পারে, দশ কোটি বছর পূর্বের ডাইনোসরের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারে, আবার কয়েকশো কোটি বছর পরের মহাবিশ্বের অবস্থাকে অনুধাবন করতে পারে। সেই মন জানে মৃত্যুর পরে তার অস্তিত্ব ছাড়াই মহাবিশ্ব চলবে যেমন চলছে কোটি কোটি বছর। কিন্তু অন্ততঃ সেই স্বজ্ঞার জন্যে মহাবিশ্বের শেষ সেখানেই। প্রতিটি মৃত্যুই একক, এক জনের সচেতনতার

অবস্থান অন্য একটি স্বত্তার অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই জন্য প্রতিটি জীবনই মূল্যবান, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বা আত্মার অমরত্বে যারা বিশ্বাস করে তারা জীবনের এই ক্ষণিকতা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে কিনা আমি জানি না ।

জীবনের সময়ের স্বলপতায় মন বিষণ্ন হলেও সে একটা "সুখের" জীবনের সন্ধান থেকে বিরত হয় না, কারণ জীববিবর্তনের অংশ হিসেবে সে তার এই ভূমিকা পালন করতে "বাধ্য"। সেই ভূমিকাকে অর্থবহুল করতে, বাধ্যতাকে মানিয়ে নিতে সে সৃষ্টি করেছে শব্দ ও সংগীত, কথা ও কবিতা, রঙ ও চিত্র, স্পর্শ ও প্রেম। নিজে বাঁচার জন্যে ও তার বংশকে বাঁচানোর জন্যে সে সৃষ্টি করেছে সমাজ ও আইন। পারসিংগার[৫] ও রামাচন্দ্রানের[২] গবেষণা হয়তো প্রমাণ করে মানুষ নিজের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর ।

৬. আমার স্বজ্ঞাঃ সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে

অ্যালবার কাম্যু তার বইতে জীববিজ্ঞানের উল্লেখ করেন নি। আমাদের চিন্তায় আত্মহত্যার স্থান আছে, কিন্তু মন আত্মরক্ষার খাতিরে এই ক্রিয়াটিকে বাস্তবায়িত করতে দেয় না। অনেক অসচেতন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটিও একটি । মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বলতে বিংশ শতাব্দীর আগে কিছু ছিল না, আর চেতনা নিয়ে একমাত্র দার্শনিকরাই ভাবতেন। কিন্তু এখন নানাবিধ কারিগরী উন্নতির সাথে সাথে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মত কোন রৈখিক যন্ত্র নয়, এর কোন প্রোগ্রামও নেই, সেই অর্থে সাধারণ রোবট বলতে আমরা যা বুঝি মস্তিষ্ক তা নয়, মস্তিষ্ক টুরিং মেশিন নয়। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন একটা বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা হারাই কোন বিশেষ স্মৃতি, হারাই কোন নির্দিষ্ট বোধ, বোঝার বা বিশ্লেষণের ক্ষমতা, ইত্যাদি।

স্থান ও কালের ধারণার মধ্যে যে রকম রহস্য আছে স্বজ্ঞার সৃষ্টিও সে রকম এক রহস্যে ঢাকা আছে । বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে তা সবসময় যৌক্তিক সংকেতে কাজ করে না। চেতনার প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অগণন বোধের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি - চোখের বাইরে নিরবিচ্ছিন্ন দৃশ্য, দৃশ্যের প্রতিটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যর সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতি, সেই স্মৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাস, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে স্বত্তার সংযোগ, এই তালিকার শেষ নেই। মস্তিষ্ককে এই সমস্ত কিছু বুঝে স্বজ্ঞার কাছে তা উপস্থাপনা করতে হবে। কিন্তু স্বজ্ঞা তো পূর্ব থেকে সৃষ্ট হয়ে নেই, স্বজ্ঞাকে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টি করতে হয়। কোটি কোটি নিউরন পারস্পরিক সংকেত আদান প্রদানের মাধ্যমে স্বজ্ঞা সৃষ্টি করে, সেই আদান-প্রদানকে হতে হবে বিরতিহীন, প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে মনে রেখে অতীতের কাছে গচ্ছিত করতে হবে। নিউরনের সংকেত ভ্রমণ করে শ্লথ গতিতে, তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন উপরোক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এক ধরণের নির্বাচন প্রক্রিয়া যা কিনা কম্পিউটারের মত নয়[৯] ।

আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে তাই সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে মস্তিষ্কে ঈশ্বর-চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে, বর্তমানে এই গবেষণার ধারাটি বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্বের একটা বিশেষ বিষয়। তবে এই ধারার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানগত মতভেদ আছে, কিছু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা মনে করে ঈশ্বর-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, একে বলা হচ্ছে adaptation, অথাৎ বিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কে আধ্যাত্মিক চেতনার আবির্ভাব মানুষকে বাঁচার বারতি সুযোগ করে দিয়েছে[১০] । কিন্তু অনেক গবেষক বলছেন, যদিও ঈশ্বরে বিশ্বাস জীবনে সান্ত্বনা আনতে পারে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা

দিয়ে জানি কাজের সময় ঈশ্বর সাহায্য করে না, বরং অতিমাত্রায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে সেই গোষ্ঠীর ধবংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে (খাদ্য উৎপাদনে, চিকিৎসায়, যুদ্ধে বা ভর্তি পরীক্ষায় ঈশ্বরের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না!)। কাজেই, এই গবেষকরা বলছেন নিজেকে ভুল বোঝানো বা ফাঁকি দেওয়ানো প্রাকৃতিক বিবর্তনে কোন সাহায্যের কারণ হতে পারে না। তাদের মতে এই পরিবর্তন কোন adaptation এর ফলে হয় নি, এটা বরং একটা প্রাকৃতিক অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে হয়েছে[১১]। অর্থাৎ মানব আবির্ভাবের উষালগ্নে বা পরে কোন mutation এর ফলে ঈশ্বর বোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয় একটি ধারা বলছে adaptation বা হঠাৎ mutation যেটাই হোক না কেন একসময় অলৌকিকতা বা ঈশ্বর-বিশ্বাস গোষ্ঠীকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের নির্বাচন মানুষকে কোন বারতি সুযোগ দেবে না। স্ক্যানডানাভীয় দেশগুলো দেখলে আমার এই তৃতীয় ধারার কথা মনে হয় - নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের ইতিহাসে প্রথমে ভাইকিং পৌত্তলিকতা ও পরে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস হয়তো এক কঠিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের গোষ্ঠীদের একত্র করে রেখেছিল, কিন্তু আজ এই দেশ তিনটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিতে একদম শীর্ষে, গীর্জার প্রভাবও এই দেশগুলিতে ন্যূনতম ।

আমরা যাকে বলি বিশ্বাস বা বিশ্বাস প্রণালী সেটা হচ্ছে একটা গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেকে দেখা যা কিনা জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে[২]। এর সাথে আসে বিশ্বস্ততা, সম্মান, ইত্যাদি আরো ধারণা যা কিনা ডারউইনীয় বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষকে সমাজের মধ্যে থাকতে সাহায্য করেছে। এটা কোনো মহাজাগতিক ধর্ম বা বিশ্বাস নয়, এটা নিতান্তই সাধারণ গোষ্ঠীবাদ যার বাস আমাদের মস্তিষ্কের মাঝেই।

উপরের আলোচনা ও ২ নং পরিচ্ছেদ (জীববিজ্ঞান) থেকে ধরে নেয়া যাক যে আমাদের সবার মস্তিষ্কে আধ্যাত্মিক চিন্তার একটা সুযোগ থেকে গেছে। করোটির আবদ্ধতায় উদ্ভূত স্বজ্ঞা জীবনের ও বিশাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজবে এটাই তো স্বাভাবিক, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও বিমূর্ততার উৎস এই অন্বেষার মাঝেই। কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বর কল্পনায় এর উত্তর নিহিত থাকতে পারে না, ঈশ্বর কোন জাগতিক (বা মহাজাগতিক) ব্যাপার হলে তারও উৎস থাকতে হবে, মহাঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আবার মহামহাঈশ্বর থেকে মহাঈশ্বর এরকম ভাবে অসীম একটা ধারার কথা ভাবা যেতে পারে। এক সীমাহীন মহামহাবিশ্বের অসীম তথ্য তাকে (বা তাদের ধরে) রাখতে হবে! আবার এরকমও হতে পারে আমাদের মহাবিশ্ব অন্য এক মাত্রার অসাবধানী ভুলোমনা ছাত্রের অমনোযোগীতার ফলাফল, সে তার অধ্যাপকের নির্দেশ না শুনে তার একসপেরিমেন্টে বেশী শক্তি বা পদার্থ ঢেলে দিয়েছিল যা কিনা কৃষ্ণবিবর হয়ে তার মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে। আর তার আগে, এই ভুলোমনা ছাত্রের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে আর এক ভুলোমনা ছাত্রের অসাবধানতার কারণে, এই রকম ভাবে একটা অসীম সংখ্যক অমনোযোগী ছাত্রের অবিমৃষ্যকারী কার্যকারণে ঘটিত মহাবিশ্বের ধারা কল্পনা করা যেতে পারে। শেষ ফলে ভুলোমনা ছাত্র সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারা আর ঈশ্বর সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারার মধ্যে কোন পাথর্ক্য নেই ।

এটা স্পষ্ট যে উপরোক্ত চিন্তাধারা খুব একটা তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না । যেমন তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না কিংবদন্তি এবং মনগড়া, অনেক সময় অযৌক্তিক, স্ববিরোধী ও অর্ধপক্ক তথাকথিত নীতিতে ভরা ধর্মগ্রন্থ। তবুও প্রথম ধারাটি আমাদের কল্পনাকে বাধা দেবে না, আমরা সেই অসীম ধারা নিয়ে গবেষণা করতে পারি, অংক কষতে পারি, এমন কি কবিতা লিখতে পারি, সব মহাবিশ্বের ভুলোমনা ছাত্ররা কেন তাদের অধ্যাপকদের আদেশ শুনছে না অথবা না শোনার সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে পারি । অনুরূপ ভাবে অসীম সংখ্যক ঈশ্বরের অনুক্রমে আমরা প্রশ্ন করতে পারি এইসব ঈশ্বরদের

কুয়ালিয়া বোধ কি ভাবে সৃষ্টি হল (বা তাদের কুয়ালিয়া আদৌ আছে কিনা) অথবা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অসীম তথ্য ও সীমাহীন সম্ভাবনার আধার হিসেবে তাদেরকেও কি স্হানগত ভাবে অসীম হতে হবে? এই প্রশ্নগুলো অন্ততঃ ইন্টারেস্টিং।

পুঁথিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন অনেকে বলে সেই ঈশ্বর মহাজাগতিক, কিন্তু একটু প্রশ্ন করলেই দেখা যাবে সেই ব্যক্তি অনুসরণ করে এমন এক গোষ্ঠীগত (tribal) তন্ত্র যা কিনা সে বংশাণুক্রমে গ্রহন করেছে। সেই ব্যক্তি মুখে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কথা বললেও কার্যক্রমে নিজের গোষ্ঠীর নিয়মানুবর্তিতার সাথে একাত্মতাবোধ করে, প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কোনো পুঁথির অবিশ্বাস্য ঘটনা "বিশ্বাস" করে। এর মাঝে ঊনিশ-বিশ হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি শিশুরা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে বড় হলে ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাসই অনুসরণ করে। পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি বারন্ত শিশুর মস্তিষ্কের কিছু নিউরন ও সিনাপস (synapse) সমষ্টিকে শক্তিশালী করে, বলতে গেলে tribal বা লৌকিক (folk) ঈশ্বরের কুয়ালিয়া এই সময়েই শিশু বা কিশোর মনে সৃষ্টি হয় । (চা অথবা ওয়াইন স্বাদ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধরনের চা বা ওয়াইন চেখে নতুন স্বাদের কুয়ালিয়া তৈরি করে যেগুলো আগে তার মাথায় ছিল না[৯])। এর সাথে যুক্ত হয় গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। ঈদের জামাত, পূজার বাজনা, গীর্জার শান্ত পরিবেশ আমাদের মনে এমনই দাগ কাটে যে তাদেরকে আমরা পরবর্তীতে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আলাদা করে দেখতে পারি না। এই সবই মাথার মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে আছে যে আমাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক ঈশ্বরকে অস্বীকার করা খুব কঠিন। বেশির ভাগ বিশ্বাসীরাই এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব একটা ভাবে না, ভাবলেও তারা নিতান্ত ট্রাইবালিজম এর কারণে সেই প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে উঠতে পারে না, এদের মধ্যে যারা চিন্তাবিদ তারা সেই ট্রাইবাল প্রথাকে মহাজাগতিক বলে প্রমাণ করারও চেষ্টা করে।

শেষাবধি বাস্তবতার জটিলতা (কুয়ালিয়া, অসীমতা, স্থানের মাত্রা, মৃত্যু, সময়ের বোধ ও উদ্দেশ্যহীনতা) সংগঠিত ঈশ্বর বিশ্বাসকে অকিঞ্চিৎকর করে দেয়, সেই অর্থে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সাথে সংঘাত বা সমন্বয় কোন আচরণই প্রযোজ্য নয়। টেমপোরাল লোবে অবস্থিত অ্যামিগডালা (amygdala) মহাবিশ্বের এক গভীর অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, তার মানে কি মহাবিশ্বের এক গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে ? মাতার মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন ও ভাসোপ্রেসিন হরমোনের মাত্রা শিশুর প্রতি মাতার ভালোবাসা নির্ধারণ করে[১২], তার মানে কি মায়ের ভালোবাসা বলে আলাদা কিছু নেই? স্বজ্ঞাই ভালোবাসার কুয়ালিয়া তৈরি করে, স্বজ্ঞাই সেই কুয়ালিয়াকে অনুধাবন করে - এই ধাঁধা সাধারণ ঈশ্বর বিশ্বাস বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম থেকে অনেক গভীর। এই ধাঁধার উত্তর হয়তো নেই, এক ঈশ্বরোত্তর পটভূমিতে এই উত্তরের সন্ধান হয়তো এক দিন করা যাবে।

গ্রন্থপন্জী

[১] http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suiciderates/en/

[২] B. J. King, Evolving God, A Provocative View on the Origins of Reigion, Doubleday Publishing, 2007

[৩] বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (১৮১৮-১৮৬০), সম্পাদনা শরদিন্দু শেখর রায়, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৭

[৪] V.S. Ramachandran, Sandra Blackeslee, Phantoms in the Brain, Quill, NY, 1998

[৫] Michael A. Persinger, Ph.D., Neuropsychological Bases of God Beliefs, Praeger Publishers, NY, 1987

[৬] Michael A. Persinger, Katherine Makarec, Temporal Lobe Epileptic Signs and Correlative Behaviors Displayed by Normal Populations, Journal of General Psychology, Vol. 114, 1987

[৭] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, মুক্তমনা

[৮] http://www.sdss.org

[৯] Gerald M. Edelman, Giulio Tononi, A Universe of Consciousness, How Matter Becomes Imagination, Basic Books, NY, 2000

[১০] Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, by Pascal Boyer, Basic Books, NY, 2002

[১১] L. A. Kirkpatrick, Toward an Evolutionary Psychology of Religion and Personality, Journal of Personality, Vol. 67, Issue 6, 1999

[১২] A Bartels & S. Zeki, The Neural Correlates of Maternal and Romantic Love, Neuroimage, 21, 1155, 2004

ড. দীপেন ভট্টাচার্য আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার গবেষক। ইমেইল- tishan2@yahoo.com